প্র্যাকটিসিং মুসলিম

বই : প্র্যাক্টিসিং মুসলিম
লেখক : নাদিউজ্জামান খান রিজভী
প্রকাশনায় : রাইয়ান প্রকাশন

প্র্যাক্টিসিং মুসলিম

নাদিউজ্জামান খান রিজভী

রাইয়ান প্রকাশন

প্র্যাক্টিসিং মুসলিম

নাদিউজ্জামান খান রিজভী

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৮১০০৪৭৭৬৩

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

৩৮০/- টাকা

PRACTISING MUSLIM

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। দরূদ ও সালাম প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর, যারা ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, নিজেদের সবকিছু দিয়ে। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

স্রষ্টা সম্পর্কে অবচেতন মানুষ নিজের অভিরুচির স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, তবে তার স্বরূপ কেবল সেই প্রস্তরখন্ডের মত— মহাকর্ষের প্রভাবে যার কেবল পতন ঘটে। সে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে সঁপে দেওয়া একটি বস্তুমাত্র; যার জীবনে কোনো অলৌকিকত্ব নেই, অসহায়ত্বে আশার আলো নেই, পতন সামলে উঠে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা নেই। তাদের জীবনে কোনো আদর্শ নেই, প্রাকৃতিক নিয়ম তার জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মুমিনের জীবন এমন নয়। মুমিন যখন আল্লাহর উপর ঈমান আনে, নিজের অস্তিত্বের সংযোগ তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তখন সে সাধারণ বস্তুর সাদৃশ্যতা হতে, প্রাকৃতিক নিয়মের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে। সে হয়ে উঠে বিশেষ, অসাধারণ, মুমিন, মুসলমান।

সময়টা তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ২০১৩। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত অস্বস্তিকর মুহূর্ত। আওয়ামী শাসন, বিএনপির হরতাল রাজনীতি, শাহবাগ আন্দোলন, হেফাজত ইসলামের উত্থান, নাস্তিক-ব্লগার হত্যা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় ধর্ম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। যদিও ইসলাম নিয়ে তখন আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মুসলিম নাম নিয়ে বড় হলেও আমার জীবনে ইসলামের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থান ছিল না। আমি ছিলাম প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, মহাকর্ষের প্রভাবে পতনশীল মানবআত্মা— জীর্ণ, অসহায়, অবহেলিত। তবে আলহামদুলিল্লাহ! মহান রবের অশেষ কৃপায় আমি সত্যকে চিনতে শুরু করি, ফিতরতের আহ্বান আমার অস্তিত্বে এসে এমনভাবে ভর করে—সে আহ্বানকে আর ফিরিয়ে দিতে পারিনি। মহান আল্লাহর নিকট অখণ্ডিত আনুগত্যের নিয়তে স্বীয় চিত্তকে তাঁর দিকে স্থির করতে বাধ্য হই।

আধুনিক যুগ ধর্মহীনতার যুগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। আধুনিক জীবনের রূপরেখার মূল পুঁজি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এটা একটি চতুর অবস্থান। কারণ মানুষের নিজ সত্তার প্রতি অভাবনীয় দুর্বলতা আছে। এ দুর্বলতাকে উন্মত্ততায় রূপান্তর করে মানুষের জীবনকে কাঠামো দেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ, আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষের হৃদয়কে গ্রাস করছে। মানুষ নিজেকে সমস্ত বন্ধন— সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, বিশ্ব— হতে মুক্ত ঘোষণা করছে। মানুষকে শেখানো হচ্ছে কীভাবে ধর্মের শেকল ভেঙ্গে স্বীয় স্বতন্ত্র চাওয়া-পাওয়াকে উঁচিয়ে রাখা যায়। জীবনকে যাপনের উৎসবে স্রষ্টার মোকাবেলায় ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। ব্যক্তির এই নব উত্থান— ঈশ্বর হয়ে উঠার স্পর্ধা— মনুষ্য সমাজ বিকাশে আদৌ ভূমিকা রাখছে কীনা, সত্যপ্রেমীদের তা বিবেচনা করা উচিত। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, সংকটময় এই সময়ে, আমার প্রথম বই 'প্র্যাক্টিসিং মুসলিম' সত্যান্বেষী পাঠকের জন্য রচনা করেছি।

আমার ইচ্ছে ছিল এমন একটি বই লেখার যেখানে ইসলামের মূল ভিত্তি তথা মৌলিক আকিদা ও বুনিয়াদি বিষয়— সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত— তদসংশ্লিষ্ট আধুনিক ভ্রান্ত বিশ্বাসের— নিহিলিজম, সেক্যুলারিজম, ফেমিনিজম, হিউম্যানিজম, লিবারালিজম— ইসলামী দৃষ্টিকোণ উল্লেখ থাকবে। ফলস্বরূপ, দ্বীনে ফিরে আসা তরুণেরা ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদি বিষয়াদি জানার পাশাপাশি আধুনিক ভ্রান্ত আকিদা এবং শরিয়তবিরোধী প্রবণতাগুলো সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে। প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হওয়ার প্রথম পাঠ হিসেবে বইটি সত্যান্বেষী পাঠকদের উপকৃত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি নিয়মতান্ত্রিক লেখক নই। শখের বশে লিখতে শুরু করেছিলাম। ২০১৪-১৫ সালে আমি সদালাপ, সামু ব্লগসহ প্রথম সারির কিছু ব্লগে লেখালেখি করেছিলাম। যদিও লেখাগুলো তেমন পরিণত ছিল না। বইটি লিখতে গিয়ে অনেক ভাইয়ের সাহায্য ও অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি। মানিক ভাই, সামাউন ভাই, আল মাসুদ আব্দুল্লাহ, শাকিল ভাই, কামরুল হাসান নকীব, মুশফিকুর রহমান, তাওহীদ, স্বাক্ষরসহ আরো অনেকে। আল্লাহ ভাইদেরকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। বইয়ের সম্পাদনা করেছেন উস্তায শায়খ ইমদাদুল হক (হাফিজাহুল্লাহ)। লেখক হিসেবে এটাই আমার বড় অর্জন। আল্লাহ শায়খের ইলমে বরকত দান করুন।

বইটি লিখতে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহর ইসলামী আকিদা, মুসলমানী নিসাব, খুতবাতুল ইসলাম হতে সাহায্য নিয়েছি। এছাড়াও মাওলানা আব্দুল মালেকের (দা.বা.) প্রবন্ধ সমগ্র এবং 'ঈমান সবার আগে' মণিমুক্তোর মত বইগুলো আমাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। এছাড়াও আরো অন্যান্য লেখকের বই ও ওয়েব পাতার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা হতে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ লেখকদের হক অনুযায়ী সমপরিমাণ সাওয়াব তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দিন।

আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র। আমি মানুষ এবং মানুষ মাত্রই ভুলে সিদ্ধহস্ত। তাই এ বইতে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ভুলগুলোর সমস্ত দায়ভার আমার এবং ভালো ও কল্যাণকর সকলকিছুর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, তাহলে বইটি আপনার নিকট রেখে দেবেন না। বরং, আপনার প্রিয় মানুষটি, যাকে আপনি একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হিসেবে দেখতে চান, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দেবেন। অবশ্যই, আপনার সালাতে ও মুনাজাতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

নাদিউজ্জামান খান রিজভী
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা
khan.rezvee@yahoo.com

সূচিপত্র

জীবন.....১৩
জীবন কী?.....১৩
জীবনের উদ্দেশ্য.....১৫
জীবন কী অর্থহীন?.....১৯
গৌরবময় দাসত্ব.....২১
উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য.....২৩
দুঃখের দীনতা.....২৪
সুখ অর্জনে বাধাসমূহ.....২৫
সম্পর্ক হলো পরীক্ষা.....২৭
নিরবচ্ছিন্ন সুখ.....২৮
দুনিয়াবি জীবন ও জান্নাতি জীবনের পার্থক্য.....২৯
পরশ্রীকাতরতা.....৩০
বিনা-কষ্টে সুখ.....৩১
জীবনের স্বরূপ.....৩২
পাথেয়.....৩৩
ঈমানের শক্তি.....৩৩
ঈমান কেমন হতে হবে?.....৩৫
ঈমানের গুরুত্ব.....৩৬
ঈমান কী?.....৩৭
ঈমান কখন আনন্দ দেয়?.....৩৮
কালেমার শর্তসমূহ.....৩৮
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ.....৪০
তাওহীদ.....৪১
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ নাম.....৪২
স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ম.....৪৩
স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য.....৪৪
স্রষ্টা দর্শন.....৪৬

স্রষ্টার অস্তিত্ব ৪৮
Poor Design আর্গুমেন্ট ৫১
আল-কুরআন আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন ৫৩
অবিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ৫৩
ফিতরাত ৫৪
স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নে বিজ্ঞানের অবস্থান ৫৫
নিরীশ্বরবাদিতা ৫৫
প্রকৃতি ও পৌত্তলিকতা ৫৬
Problem of Evil আর্গুমেন্ট ৫৭
পাপ সংঘটনে শয়তানের কর্মপদ্ধতি ৫৯
আল্লাহকে আমাদের কেন প্রয়োজন? ৬১
স্রষ্টা-ভীতি ৬৫
মানবধর্ম ৬৭
বহু ঈশ্বরবাদিতা ৬৮
ধর্মের উৎপত্তি ৭০
একেশ্বরবাদ ৭২
আল্লাহর প্রতি ঈমান ৭২
রিসালাত ৭৫
রিসালাতে বিশ্বাস কালেমার অংশ ৭৬
পাপশূন্যতা ৭৭
তাঁরা ছিলেন রক্ত-মাংসের মানুষ ৭৮
মু'জিযা ৮০
কারামত ৮১
নবী মুহাম্মাদের মর্যাদা ৮২
জন্ম ও পরিচয় ৮৩
ঈদে মিলাদুন্নবী ৮৪
বাল্যকাল ৮৫
বিবাহ ৮৫
আয়েশা (রা.) এর সঙ্গে বিবাহ ৮৮
বাল্যবিবাহ ৮৯

দাওয়াতি কার্যক্রম ৯১
দাওয়াতের সামাজিক প্রভাব ৯২
মদীনা রাষ্ট্র ৯৫
স্বকীয়তা জাতি হিসেবে উত্থানের পূর্বশর্ত ৯৬
ঐক্যচিন্তা ৯৭
হীনমন্যতার কারণ ১০০
জাতীয়তা ও ইসলাম ১০৩
সাম্প্রদায়িকতা ১০৫
সাম্প্রদায়িকতা এবং মানব-প্রকৃতি ১০৮
ধর্ম যার যার, উৎসব সবার ১১২
বিজয় ১১৪
বনু কুরায়যা হত্যাকাণ্ড ১১৫
বিদায় হজ্জ ১১৭
অন্তিম নসিয়ত ১১৮
হায়াতুন্নবী ১১৯
ইলমুল গায়েব ১১৯
ভক্তি ও ভালোবাসা ১২২
কেমন ছিলেন তিনি? ১২৩
সুন্নাত ও বিদআত ১২৬
সাহাবিদের প্রতি ভালোবাসা ১৩২
সমাজ সংস্কার ১৩২
কিতাব ১৩৪
কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ১৩৪
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং কুরআন ১৩৫
কুরআন সংরক্ষণ ১৩৭
কুরআন সংকলনের ইতিহাস ১৩৯
হাদীসের প্রামাণিকতা এবং কুরআন অনলি মুভমেন্ট ১৪২
কুরআন কী মানুষের লেখা? ১৪৬
কুরআন ও বিজ্ঞান ১৫১
বিবর্তনবাদ ১৫৮

জিহাদ, জঙ্গীবাদ ও কর্তৃত্ববাদ ১৬২
জঙ্গি অপবাদ..... ১৭৩
দাসপ্রথা..... ১৭৪
বহুবিবাহ..... ১৭৯
বাস্তবসম্মত ও মধ্যপন্থী জীবনব্যবস্থা..... ১৮৩
কুরআন ন্যায়-নীতির মানদণ্ড ১৮৪
অপরিবর্তনশীলতা..... ১৮৫
পরিবর্তনশীলতা ও হিন্দুধর্ম ১৮৬
কুরআনেই মুসলিমের সম্মান ১৮৮
তাকদীর..... ১৮৯
তাকদীর অস্বীকারের পরিণতি ১৯০
তাকদীর কী? ১৯১
তাকদীরের স্তরসমূহ..... ১৯১
স্বাধীন ইচ্ছা ও তাকদীর..... ১৯২
আল্লাহর ইচ্ছা এবং বান্দার ইচ্ছার সমন্বয় ১৯৪
আল্লাহর ইচ্ছা ১৯৫
ফেরেশতা ১৯৮
আখিরাত..... ২০০
আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ২০০
ইহজাগতিকতা..... ২০১
Pascal's Wager আর্গুমেন্ট..... ২০৩
অবিশ্বাসের ক্ষতি ২০৬
মৃত্যু..... ২০৭
কবর..... ২১১
কিয়ামত ও আলামত..... ২১২
মাসিহতত্ত্ব ২১৩
আদিপাপ..... ২১৫
হাশর ২১৬
জান্নাত-জাহান্নাম ২১৬
ইবাদত ২১৭

ইসলামের ভিত্তি ২১৭
দায়িত্ব এবং অধিকার ২১৮
ইবাদতের সংজ্ঞা ও স্তম্ভ ২২১
সালাত ২২১
স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সংযোগ ২২২
সালাত অপরিহার্য.....২২২
সালাতের গুরুত্ব ২২৪
সালাতের শক্তি ২২৫
সালাতে অবহেলা.....২২৭
সালাতে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ২২৮
সালাতের শিক্ষা.....২২৯
সালাতে নিয়মিত হওয়ার উপায় ২৩০
সিয়াম ২৩৩
সিয়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য.....২৩৩
রমাযান মাসের ফযীলত..... ২৩৪
রমাযানে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে ২৩৬
ক্ষুধার তাৎপর্য ২৩৬
ঈদুল ফিতর.....২৩৮
সংস্কৃতি ও ইসলাম ২৩৯
ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের পার্থক্য ২৪১
যাকাত.....২৪২
মানুষ এবং বস্তুর সম্পর্ক ২৪২
সমতা..... ২৪৪
মান-মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া..... ২৪৬
বস্তুবাদী সমাধান ২৪৭
ভোগবাদ..... ২৪৮
ইসলামের সমাধান..... ২৪৯
যাকাত..... ২৫১
হজ্জ ২৫৩
হজ্জ এবং পৌত্তলিকতা ২৫৩

হজ্জের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ২৫৪
কুরবানির পরিবর্তে অর্থদান..... ২৫৭
নারীবাদ ও ইসলাম..... ২৫৯
আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য.....২৬০
নারীবাদ আন্দোলন ও নারীপ্রকৃতি ২৬১
নারী বন্দনা..... ২৬২
আন্দোলনের রূপ-প্রকৃতি ও মানদণ্ড ২৬৩
নারীবাদ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি.....২৬৫
নারীবাদ ও ব্যক্তিস্বার্থ ২৬৭
কল্পজগৎ.....২৬৮
নারী এবং ইসলাম প্রসঙ্গ.....২৬৮
অর্থনৈতিক শক্তি ২৭৩
নারীর মর্যাদা কোথায় নিহিত..... ২৭৬
নারীর কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ কী বৈধ?.....২৭৭
পর্দা.....২৮০
পোশাক ২৮০
মুসলিমের পোশাক ২৮২
পর্দা কী প্রগতিশীলতার অন্তরায় ২৮২
যৌন হেনস্তায় ধার্মিক ও সেক্যুলারদের অবস্থান.....২৮৩
পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য..... ২৮৪
পর্দা কী কেবল একটি পোশাক? ২৮৫
পর্দা একটি ইবাদত ২৮৭
শেষকথা.....২৮৮

জীবন

কালের পরিক্রমায় মানুষের জীবন হয়েছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। ব্যস্ততা পাহাড়সম। এমনকি প্রিয়তমার মিষ্টি-মধুর-দ্যুতিময় চাহনিখানি প্রাণভরে দুদণ্ড অবলোকন করার সময়টুকু মেলানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। আধুনিক জীবনপদ্ধতি আমাদের জীবনকে গতি দিলেও, কেড়ে নিয়েছে তার আসল রং-রূপ ও বৈচিত্র্য। বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে ভোগবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। ফলে সমাজে চিন্তাশীল মানুষের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। সারা দিনের ব্যস্ততায় জীবন নিয়ে ভাবার সময়ই-বা কোথায়? তবুও কিছু প্রশ্ন মানুষকে কম-বেশি ভাবতে বাধ্য করে। বিশেষ করে অস্তিত্বের সূত্রপাত এবং কারণ সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ আদি থেকেই।

আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। পৃথিবীর নিবিড় পরিবেশে বেড়ে উঠছি। ক্ষণিকের এই জীবনে আমরা অনেকগুলো সম্পর্কের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে জীবন চলতে থাকে। আবার একটি নির্দিষ্ট সময় পর সম্পর্কের সব বাঁধন ছিন্ন করে পরপারে চলেও যেতে হয়। কেন আমরা জন্মগ্রহণ করলাম, আবার কেনই-বা মারা যাব? জন্ম-মৃত্যুর মাঝামাঝি এই সময়টুকু আমাদেরকে কেন দেওয়া হলো?

জীবন কী?

জীবনকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করে। জীবন কারো কাছে প্রতিযোগিতা, কারো কাছে খেল-তামাশা, কারো কাছে অর্থহীন, আবার কারো কাছে জীবন হলো যুদ্ধ বা সংগ্রাম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে হয়তো সকল সংজ্ঞার্থই যথার্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও আমার কাছে, 'জীবন কী?' এটা কোনো মৌলিক প্রশ্ন নয়। আমরা অস্তিত্বে আছি, এটাই তো আমাদের জীবন। বরং মৌলিক প্রশ্ন হলো—জীবনের উদ্দেশ্য কী?

প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো লক্ষ্যের পিছনে ছুটে চলেছে। কেউ চায় খ্যাতি কিংবা অর্থ, আবার কেউ চায় মধ্যবিত্তের সাধারণ জীবন। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত সকল প্রকার জীবনেই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জীবনকে যেরূপেই ধারণ করার

চেষ্টা করা হোক না কেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টটিকে নির্ধারণ করার মতো কোনো মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই। আদর্শ-জীবন অস্তিত্বহীন। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের চে' অত্যধিক অর্জনের চেষ্টায় কতজনই-বা সফল হয়? কিন্তু খাদ্য-বিশ্রাম-যৌনতায় সীমাবদ্ধ জীবনকে আমরা কেউই উৎকৃষ্ট জীবনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করি না। জীবনের এরূপ লঘু অর্থ কারো কাছে-ই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের সমস্যা হলো, জীবনের সংজ্ঞার্থ আমরা সাধারণত অযোগ্যদের কাছ থেকেই নিয়ে থাকি। জীবনের সংজ্ঞার্থ কি আমরা এমন কারো কাছে থেকে গ্রহণ করব, যার মানুষকে দেখার দৃষ্টি কেবল অর্থ-সম্পদের বলয়েই আবর্তিত হয়? যার কাছে গরিব কৃষকের জমিদার হয়ে উঠার গল্প, সফল জীবনের আত্মকথা হিসেবে বিবেচিত হয়?

অর্থ-সম্পদের ভিত্তিতে কিংবা খ্যাতির ভিত্তিতে জীবনের মানের পরিবর্তন হলেও, রূপের পরিবর্তন হয় না। যে কৃষক গরিব অবস্থায় দেশীয় সস্তা মদে আসক্ত ছিল, জমিদারী অর্জনের পর, সে সুন্দরী ললনাদের হাতে বিদেশী শরাবের পেয়ালায় চুমুক দেয়। জীবনের পার্থক্য কোথায়? জীবনে ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আত্মা, হৃদয় ও চেতনার তো কোনো পরিবর্তন হয় নি! বরং জীবনীশক্তি বৃদ্ধির কারণে তাদের পাপের শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবাই স্বাধীন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে না, কিছু মহামানব স্বাধীনতা অর্জনের জন্যও জন্মগ্রহণ করেন। কারো জীবন দামি গাড়ি থেকে শুরু করে বিলাসবহুল উড়োজাহাজ পর্যন্ত বিস্তৃত; আবার কারো জীবন রিক্সা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কারো অর্জন পৃথিবী সংরক্ষণ করে, আবার কারো অর্জন মাটির সঙ্গে মিশে হারিয়ে যায়। প্রত্যেকের জীবন এক নয়; বরং বৈচিত্র্যময়। এজন্য জীবনের এমন এক মৌলিক ও সাধারণ সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা প্রয়োজন–যা সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

জীবনকে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করা বেশ কঠিন কাজ! কারণ জীবন যেমন বহুস্তরবিশিষ্ট, তেমনি এর স্বরূপ বৈচিত্র্যময়। সর্বদিক বিবেচনায়, 'জীবন'কে আমি একটি পথ বা রাস্তা হিসেবে দেখি। যে পথের একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্য রয়েছে। তবে সে গন্তব্যে পৌঁছনো সহজ নয়! গভীর-গহিন-কণ্টকময় এ পথে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য

জীবন একটি পথ; যা জন্মের মাধ্যমে শুরু এবং মৃত্যুতে শেষ হয়। কিন্তু বাস্তবিক জীবনে সে পথটি কী, কোন পথ যাত্রায় মুক্তি মিলবে, সে রহস্যের সমাধান আমাদের করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র আমাদেরকে যে দিকে ধাবিত করে, আমরা সেদিকেই নিজেরদেরকে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কেউ চিকিৎসক হতে চায়, কেউবা প্রকৌশলী। ক্যারিয়ার ভিত্তিক আমাদের এ লক্ষ্যগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু এগুলো কোনোভাবেই সকলের জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ উদ্দেশ্যগুলো পূরণ না হলেও কারো জীবন থেমে থাকে না। এগুলোকে কেন্দ্র করে আটকে থাকাটাই বরং মূর্খতা। আসলে তাত্ত্বিক এ জীবনে, আমরা একটি বাক্সের মধ্যে আটকে পড়েছি; এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছাও যেন আমাদের মধ্যে নেই! জীবনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে এবং শেকড়ের দিকে ধাবিত হতে হলে, তত্ত্বময় এ জীবন ছেড়ে বাক্সের বাইরে আসতে হবে।

ধরা যাক, বিশাল এ পৃথিবীতে একজন মাত্র মানুষ রয়েছেন। তাকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। এমন অবস্থায় নিজের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সে কীভাবে নির্ধারণ করবে? আসমানী প্রত্যাদেশ, সংজ্ঞা (Intuition) কিংবা নবী ইবরাহীমের (আঃ) মতো উপলব্ধি শক্তি না থাকলে এ রহস্য ভেদ করা বেশ শক্ত।

রাত-দিনের পরিবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ, বায়ুপ্রবাহ, বাস্তসংস্থান, নদীর জলপ্রবাহ, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের শীতলতা, গ্রীষ্মের দাবদাহ, বসন্তের স্নিগ্ধতা, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জাতের ফুল ও ফল, চাঁদ ও সূর্যের পরিভ্রমণ, ধুমকেতু, ছায়াপথ- পুরো বিশ্বজগৎকে যেন একটি সুন্দর ছন্দে সাজানো হয়েছে। কেউ যেন সৃষ্টির এ অমোঘ সূত্রগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছেন। সব কিছু কী চমৎকার! প্রকৃতির এ নিয়মের কোনো ত্রুটি নেই, নেই কোনো পদস্খলন!

আমরা শ্বাস নিচ্ছি-ছাড়ছি, চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শ্রবণ করছি, মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছি। আমাদের পুরো দেহ যেন একটি সুনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু, যৌবন-বার্ধক্য, প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম-কানুন এবং এর কার্যক্রমকে খুব ভালোভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হয়, পুরো সৃষ্টিজগৎ যেন সবার থেকে ক্ষমতাবান কোনো এক অসীম সত্ত্বার আনুগত্য করে

চলেছে। তাঁর হুকুমের তাবেদারি করে চলেছে। তিনি যেভাবে সবকিছু সাজিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টি তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছে। নিয়মের ব্যতিক্রম অন্যকিছু করার ইচ্ছাও যেন তাদের মধ্যে নেই। এ অসাধারণ সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। নিশ্চয় এগুলোকে অযথা সৃষ্টি করা হয় নি! এগুলো সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নি। আপনি পবিত্র, সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।[১]

জীবনের মর্ম কিংবা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পূর্বে, জ্ঞান ধারণের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এ যোগ্যতা তখনই অর্জিত হয়, যখন মানুষ তার স্বীয় রবকে চিনতে পারে। মানুষ যখন তার রবকে ভুলে যায়, তখন সে নিজেকেও ভুলে যায়। নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণায় নিপতিত হয়। স্বীয় সত্ত্বা এবং পুরো সৃষ্টিজগতের সত্ত্বাগত ক্ষুদ্রতাকে তখন সে হৃদয় ও মগজে ধারণ করতে পারে না। আল্লাহর বড়ত্বের জায়গায় সে নিজেকে স্থাপিত করে। স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে গর্ব ও বড়াই করে।

জান্নাতে যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল, সে মানুষ এখন নিজেই শয়তানের সৃষ্ট ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করছে। মানুষ তার স্বীয় ক্ষুদ্রতা নিয়ে ইবলিশের মতো অহংকারে নিপতিত হয়েছে। জাতি, বর্ণ, সংস্কৃতি, মেধা, পেশা ইত্যাদি নিয়ে বাদ-বিবাদে মানুষ পৃথিবীকে শয়তানের লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। এ মানুষগুলো নিজের অস্তিত্ব নিয়েই গর্বিত। তাদের এ অহংকার তাদের কেবল অবাধ্যতার দিকেই ধাবিত করবে। এরা নিজেকেও চিনে না, নিজের রবকেও চিনতে পারবে না। জীবনের প্রকৃত রহস্য কখনোই এদের নিকট উন্মোচিত হবে না।

[১] সূরা আল ইমরান: ১৯১

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

> এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।[১]

উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থতার কারণ–পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অসচেতন এবং জ্ঞানশূন্য। সত্যকে আবিষ্কারের স্পৃহা মানুষের বরাবরই কম। ফলস্বরূপ, অধিকাংশ-ই সত্যের সাক্ষী হতে পারে না। পলায়ন প্রবৃত্তির দরুন সে সত্য বা বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। মানবসত্ত্বার উপাদান বিচারে ধ্রুবসত্য হিসেবে কী প্রতীয়মান হয়? তা হচ্ছে মানুষের মৃত্যু রয়েছে। মানব সত্ত্বার অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার ধ্বংসশীলতা। সে বিলীন হবে, হারিয়ে যাবে মহাকালের অতল গহ্বরে।

পলায়ন প্রবৃত্তির পাশাপাশি মানুষের রয়েছে কল্পনার শক্তি। বাস্তবতার মধ্যে বেঁচে থাকা বিষাদময়। তাই সে কল্পনার জগতে আপন দুনিয়া নির্মাণ করে। অমৃতের সুধা পান করে কল্পনার জগতে সে হয়ে উঠে অপার শক্তিময়-অমর-চিরজীবী।

কল্পনার জগতে মানুষ অত্যন্ত প্রতিবাদী। যাবতীয় জুলুম, অত্যাচার, দুঃখ-কষ্টকে সে তার অতিমানবীয় কল্পনার শক্তিবলে দমন করে। কিন্তু মানুষের এ কল্পনা বাস্তবতার সঙ্গে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। কল্পনার জগতে যে যত বেশি সরব, বাস্তব জীবনে সে ততটাই নির্বাক, নীরব ও কাপুরুষ।

মানবতার মহান পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ ﷺ এমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ। তিনি মানুষকে তুচ্ছ-মিথ্যা-কল্পনার জগত থেকে বের করে এনে প্রকৃত বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। জাগতিকতাকে পরিহার, বারংবার মৃত্যু ও আখিরাতকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত্যুকে স্মরণ ও স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া।

মানুষ কল্পনাতে নিজের মতো করে বাঁচতে শিখেছে। নিজের মতো করে বেঁচে থাকার এ প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। কল্পনা খারাপ বা দোষের কিছু নয়। কিন্তু কল্পনাকে অবশ্যই জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। বাস্তব দুনিয়া বিবর্জিত কল্পনা আনন্দ দিতে পারে, অনুভূতির সীমাহীন প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে, হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে। এরূপ কল্পনার কর্মবিস্তৃতি এখানেই শেষ। কিন্তু ধর্মের স্বর্গ-নরকের

[১] সূরা আনকাবুত: ৬৪

ধারণা বা কল্পনা বাস্তবতার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক নয়। মানুষের জাগতিক কর্মের প্রতিফলিত রূপই হচ্ছে জান্নাত-জাহান্নামের রূপ। ভয়ংকর সাপ, বিচ্ছু কিংবা হুর-পরীর আখ্যানকে যুক্তিবিচারে কল্পনা হিসেবে বিবেচনা করলেও তা বাস্তবতাবর্জিত নয়। জান্নাত-জাহান্নামের চিন্তা মানুষকে শুদ্ধ করে। উন্নত নৈতিক মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

অন্যদিকে কল্পনা মানুষের পলায়ন প্রবৃত্তিরই একটি অংশ; বাস্তবতা থেকে পলায়নের পন্থা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশেও ঘাস, লতা-পাতা, পাখি, নদী-সমুদ্র, নারী-প্রেম ইত্যাদি নিয়ে শত শত ছন্দের জন্ম দেওয়া মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাস্তবতা থেকে মুখ লুকানো এসব মানুষকে সমাজ বিচ্ছিন্ন বললেও ভুল হবে না। এদের মুখে আদর্শের কথা মানায় না। সংকট-সংঘাতের মুহূর্তে এ শ্রেণির মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানুষ দূরে থাকতে চায় জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে। তাই সে পলায়নের অনেকগুলো পন্থার উদ্ভাবন করেছে। আধুনিক জীবন যাপনের পদ্ধতি ও তার রূপ মানুষের পলায়ন প্রবণতাকে মাথায় রেখেই নির্মাণ করা হচ্ছে। মানুষের দুর্বলতা নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। গান-নাচ-ব্যভিচার-নেশা ইত্যাদি সবকিছুই মানুষকে ক্ষণিকের জন্য বাস্তবজগত থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। তবে এ স্বস্তি চিরমুক্তি নয়।

সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের জীবন অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। সে দ্বায়িত্বশীল এবং তার উপরে মহান স্রষ্টার দাসত্বের গুরু দ্বায়িত্ব রয়েছে। সে অসচেতন-অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করতে পারে না। জীবনাদর্শে তাকে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হয়। ক্ষণিকের স্বস্তি কিংবা আনন্দের জন্য আনাড়িপনায় কালযাপন কাম্য নয়। পুঁজিবাদীরা মানুষের এ পলায়ন প্রবণতা সম্পর্কে অবগত। এটাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের ব্যবসার পরিধি বিস্তার করছে। পলায়ন প্রবৃত্তিকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন আদর্শ। ফুলে ফেপে উঠছে পুঁজিবাদীদের ব্যাংক-ব্যালেন্স।

আনন্দ-ফূর্তি, খেল-তামাশায় নিমজ্জিত জীবনকে অর্থহীন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সে জীবনে প্রদর্শনের মতো উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। অর্জনের খাতা শূন্য। একুশ শতাব্দীতে শতভাগ বিনোদন নির্ভর যে জীবনকাঠামো আমরা নির্মাণ করেছি, তা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। রুখে দিতে হবে সকল পলায়ন প্রবৃত্তি। সচেতন, বাস্তববাদী, কল্যাণকামী হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে মানবতার কল্যাণে।

জীবন কী অর্থহীন?

জীবন মূলত তাদের কাছেই তামাশার উপকরণ যারা অনাশ্রিত–স্রষ্টার পদতলে যারা আশ্রয় পায় নি। এরূপ মানুষের কাছে 'জীবন'-এর আলাদা কোনো গুরুত্ব প্রকাশ পায় না। জীবন তখন অর্থহীন-অদ্ভূত। জীবনের আগের এবং পরের অধ্যায় অন্ধকার। ফলস্বরূপ, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী কালকে শূন্য ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জীবন তাদের কাছে শনি থেকে শুক্র, সাতদিনের অর্থহীন পুনঃপুনঃ আগমন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিন্তু নিরর্থকতা জীবনের স্বরূপ হওয়া উচিত নয়। আমাদের অস্তিত্বের আলাদা অর্থ চাই, চাই আঁকড়ে ধরার অবলম্বন। হোক তা অদ্ভূত কল্পনা! তবুও তা শূন্যের চে' বেশি কিছু। পবিত্র গ্রন্থ বা মহাপুরুষদের প্রচারিত বিশ্বাসকে আমরা যতই কল্পনা বলে নাক সিটকায় না কেন, অন্তত তা শূন্য-অর্থহীন-অদ্ভূত-নিরর্থ নয়।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের অর্থ নির্ধারণের কাজ মানুষের নয়। সে দ্বায়িত্ব মহান স্রষ্টার। মুক্তা ঝিনুকের জন্য ব্যধি হলেও মানুষের কাছে তা মূল্যবান। তেমনিভাবে জীবনের নিরর্থকতাকে কাটিয়ে মহান স্রষ্টার চোখে স্বীয় জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। মানুষের সকল কর্মই মহাশূন্যে হারিয়ে যায়, শুধুমাত্র সেগুলো ব্যতীত যা মহান আল্লাহর নিকটে সমর্পণ করা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে সম্পাদিত সকল কর্মকে মহান আল্লাহ সযত্নে সংরক্ষণ করেন। সেগুলোর প্রতিদান প্রদান করেন। আর সে প্রতিদান কতই না উত্তম প্রতিদান!

আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ:) কে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। নইলে দিক-ভ্রান্তের মতো তাঁকে বিচরণ করতে হতো উদ্দেশ্যহীনভাবে। তিনি সে শিক্ষা তাঁর সন্তানদেরকেও দিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে শয়তানের প্ররোচনা ও শত্রুতায় মানুষ তাদের জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। ভুলে গেছে এ জীবন ক্ষণিকের অবস্থিতি মাত্র। এ ভোগ-সম্পত্তি কেবল স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

> অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।[১]

এ পৃথিবী আসলে আমাদের প্রকৃত ঠিকানা নয়। ক্ষণিকের জন্য এ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান। এ দুনিয়ার জীবন মূলত পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। এ জীবন আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত হলে অপেক্ষা করছে কাঙ্খিত চিরমুক্তিময় জীবন। এজন্য মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়মিশ্রিত আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। পুরো সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ সকল কাজের কর্মসূচি বণ্টন করে দিয়েছেন। সেভাবে কাজ করাটা-ই হলো তাদের জন্য আনুগত্য প্রকাশ। সমগ্র সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহর দেওয়া কার্যসূচির নিঁখুত অনুসরণ করে চলেছে। তদ্রুপ প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষকেও আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ.

> তুমি কি দেখ নি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ।[২]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনজাতি সৃষ্টি করেছি।[৩]

إِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ.

> নিশ্চয় আল্লাহ আমার এবং তোমাদের রব, সুতরাং তাঁর ইবাদত করো, এটাই হলো সরল পথ।[৪]

---

[১] সূরা বাকারা: ৩৬
[২] সূরা হাজ্জ: ১৮
[৩] সূরা যারিয়াত: ৫৬
[৪] সূরা আল ইমরান: ৫১

গৌরবময় দাসত্ব

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদাত ও দাসত্ব করার জন্য। একজন ইঞ্জিনিয়ারের তৈরি মেশিন তা-ই করে, যা তার ভেতরে প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়। অন্যান্য সৃষ্টির চে' মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। অন্যান্যদের পদস্খলনের ক্ষমতা নেই, মানুষের রয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষকে সম্মানিত করার জন্য মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে অহমিকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর এ অহংবোধে তাড়িত হয়ে মানুষ জীবনের মৌলিক ও প্রধান উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেছে। আর এ ভুলে যাওয়া রোগে মানব জাতি আজ দারুণভাবে আক্রান্ত-বিদ্ধস্ত। ফলস্বরূপ, মানুষ এখন পথভোলা পথিকের ন্যায় মরীচিকার পেছনে মত্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদের কেবল তাঁর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের সূত্রপাত হয়েছে কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর মতো একটি বিপ্লবী বাক্য দিয়ে। যা যালিম এবং অত্যাচারীদের অপছন্দনীয়। কারণ এ কালিমার মাধ্যমে সৃষ্টির দাসত্ব ত্যাগ করে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বের দাবি জানানো হয়েছে। আর এ দাবি পুরো বিশ্বে ইসলাম ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছে।

প্রত্যেক মানুষই দাস। কেউ মানুষের দাস, কেউ তার অহংকার ও প্রবৃত্তির দাস, কেউ অর্থ-সম্পদ কিংবা খ্যাতির দাস। দাসত্বের আরো নানারূপ চারিদিকে বিক্ষিপ্তরূপে বিরাজমান। কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর দাসত্ব ব্যতীত অন্য সবকিছুর দাসত্বকে হারাম করে দিয়েছেন।

'দাসত্ব'এবং 'দাস' শব্দ দুটি মানুষের কাছে অপছন্দনীয়। কারণ এতে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়। এবং 'দাস' শব্দটি শুনলে, ভয়াবহ এক প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। দাস বলতে আমরা সাধারণত এমন একজন মানুষকে বুঝি, যার উপর নির্যাতন করা হচ্ছে, শারীরিক-মানসিক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু মহান আল্লাহর দাসত্বের প্রকৃতি তো এরূপ নয়। আল্লাহর দাসত্ব অর্থ তাঁকে সবকিছুর চে' বেশি ভালোবাসা, তাঁর বড়ত্বের ঘোষণা দেওয়া, তাঁর ইচ্ছাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র যে মনিব-দাসে

সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং সেখানে রয়েছে ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আশ্রয়। সবল মানুষ দুর্বলদের দিয়ে তার নিজের খায়েশ মিটিয়ে থাকে। এটা তারা করে নিজেদের স্বার্থ-মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নের মধ্যে মানুষের নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

একজন মানুষের অন্য মানুষের উপর কর্তৃত্ব নেই। এজন্য মানুষ হিসেবে মানুষের দাসত্বকে আমরা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু মহান আল্লাহ তো ধূলি-মাটি দিয়ে তৈরি নির্জীব কোনো সত্ত্বা নয়; বরং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। আমাদের জীবন ঘুড়ি হলে, লাটাই তাঁরই হাতে। এমন সত্ত্বার দাসত্ব করা লজ্জার নয়; বরং গৌরবের।

মানুষ মূলত ক্ষমতাহীন, স্বীয় সত্ত্বা নিয়ে মানুষের গর্ব করার কিছু নেই; তাই সুযোগ পেলে মানুষ ক্ষমতা প্রদর্শনের নেশায় মত্ত হয়। এজন্য দাসত্ব অর্থই আমাদের কাছে শোষণ। কিন্তু আমাদের রব তো নিজেই অপার ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে আমাদের দিয়ে যা ইচ্ছা করাতে পারেন; কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি চাইলে আমরা ফেরেশতাদের মতো ইবাদাতগুজার হতে পারতাম, তাঁর অবাধ্য হওয়ার কথাও হয়তো আমাদের চিন্তায় আসত না। কিন্তু তিনি আমাদেরকে সক্ষম বানিয়েছেন–নিজের অভিরুচি বাস্তবায়ন করার।

তিনি পৃথিবীর জীবনকে বানিয়েছেন মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। মহান আল্লাহ যাচাই করে নিতে চান, কে নিজের ইচ্ছার বিপরীতে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে পারে, কে তাঁর আনুগত্যে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে? এটাই ইবাদাতের মর্মকথা। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও এখানেই নিহিত।

উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য

মানুষ সাধারণত জীবন নিয়ে কখন চিন্তা করে? যখন হতাশা-নিরাশা-দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-চঞ্চলতা-অস্থিরতার আনুপাতিক সমন্বয়ে এক অশান্তময় পরিবেশ চারপাশে তৈরি হয়। কেউ চায় ব্যক্তির উৎকর্ষ তত্ত্ব, কেউ চায় সমাজ বা রাষ্ট্রের নৈতিক ও অবকাঠামোগত উৎকর্ষের আদর্শবাদী চেতনা। মানুষের চাওয়া-পাওয়া-প্রতিষ্ঠার এ আকাঙ্ক্ষার পেছনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে হতাশা-নিরাশা-নৈরাজ্য-দুঃখ-কষ্ট-বেদনামুক্ত শান্তিময়-নির্মল পৃথিবী। মানুষের কর্মোদ্দীপনার মূল প্রভাবক হচ্ছে সুখ। মুমিন আল্লাহর ইবাদতও করে একই উদ্দেশ্যে–প্রশান্তি বা সুখ অর্জনের জন্য। বৃহৎ অর্থে মুক্তি অর্জনের জন্য; দুনিয়া এবং আখিরাত জীবনে।

'সুখ' শব্দটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। সুখ-পাখির সন্ধান করে না পৃথিবীতে এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। কে না চায় সুখী হতে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখী কত জন হতে পারে? কারণ অধিকাংশ মানুষ সুখ কী, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এবং সুখ অর্জনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও তারা অবগত নয়। আমরা অনেকেই মনে করি, সুখ তখনই পাওয়া যায়, যখন নিজের ইচ্ছামতো চলা যায়, পছন্দানুযায়ী যা খুশি করা যায়। অধিকাংশ মানুষের কাছে জীবনের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার অর্থই হলো সুখ। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এই ধারণার ভুল ধরতে পারে। এ যেন গরুকে রাখাল ছাড়া ছেড়ে দেওয়ার মতো। কার ফসল নষ্ট করল, কার বাগানের শাক-সবজি খেল, এ সম্পর্কে মালিকের অনাগ্রহী থাকার মতো। যা খুশি তা করার মধ্যেই যদি সুখ থাকত, তবে পুরো সমাজে বিশৃঙ্খলার শেষ থাকত না। চোর চুরি করে, নেশাখোর নেশা করে, খুনি খুন করে, সুদখোর সুদ খেয়ে, ধর্ষক ধর্ষণ করে খুশিতে থাকত।

সুখ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বস্তুকেন্দ্রীক। আমরা চিরস্থায়ী সুখের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী সুখকে বেশি প্রাধান্য দিই। যেমন আমরা অনেকেই মনে করি–যার যত বেশি সম্পদ, সে তত বেশি সুখী। কিন্তু এ ধারণাটি আসলে সঠিক নয়। সম্পদ কম হোক বা বেশি, অর্থ দিয়ে সুখ অর্জনের চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। এক শ্রেণির মানুষ এ সত্যটি স্বীকারও করে; কিন্তু তাদের এ স্বীকৃতি প্রদান করার কারণ হচ্ছে–তারা তাদের জীবনে সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। সম্পদ এবং সুখ কেন্দ্রীক এ সত্যটিকে অনেকে মেনে নিলেও, এ দৃষ্টিভঙ্গি চর্চাকারীর সংখ্যা খুবই কম।

দুঃখের দীনতা

একটি প্রবাদ আছে 'টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না।' অতি বাস্তব কথা। কারণ যার সম্পদ কম আছে, তার চিন্তা কীভাবে তা বাড়ানো যায় এবং যার সম্পদ বেশি আছে সে চিন্তা করে কীভাবে তা ধরে রাখা যায় এবং পর্যায়ক্রমে আরো বৃদ্ধি করা যায়। এ ধরনের চিন্তা আমাদের সুখের সন্ধান তো দেয়-ই না; বরং সুখ থেকে আমাদেরকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মোটা টাকা উপার্জন করে আকাশ ছোঁয়ার নেশায় আমরা সুউচ্চ দালান নির্মাণ করি, কিন্তু জীবনের বাকি প্রয়োজন মেটাতে সেই ধূলিময় মাটিতে পা রাখতে হয়, এ সত্যটি আমরা মনে রাখতে চাই না। যে মাটিকে আমরা তুচ্ছজ্ঞান করি, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সেই মাটি থেকেই আসে। শেকড়কে অস্বীকার করে গাছের অস্তিত্ব কল্পনা করা খুব কঠিন! ঠিক তেমনি জীবনে আল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত না করে সুখ-অর্জনের চেষ্টাটিও ব্যর্থতার তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, কীভাবে অল্পতে এবং যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মুমিনের একটি ভরসার জায়গা রয়েছে। সে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ আছেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তা-ই তিনি করবেন।

সুখ একটি বড় নিয়ামত। সম্পদ কিংবা শক্তি দিয়ে সুখ কেনা যায় না। সুখের সাথে বরকতের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুখ এবং বরকত উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। জীবনে উভয়েরই দরকার রয়েছে। অনেকের আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিলাস বহুল বহুতল ভবনেও সুখ নেই, আবার অনেকের জরা-জীর্ণ কুঁড়ে ঘরেও সুখের বন্যা হয়। কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে পরিবারের সকল চাহিদা মেটাতে হিমশিম খায়, আবার কেউ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সংসারের সকল চাহিদা মিটিয়ে ফেলে। এটাই হলো বরকত। অর্থনীতি আমাদের এটাই শিখিয়েছে যে, অভাব চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যার চাহিদা বেশি তার অভাব বেশি, যার চাহিদা কম তার অভাব কম। এক্ষেত্রে সুখ অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। যার অভাব বেশি, তার সুখ কম। যার অভাব কম, তার সুখ বেশি। অর্থ কম থাকা অভাব নয়, বরং চাহিদা বেশি হওয়াই অভাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য।[১]

সুখ এবং বরকত উভয়ই দৃশ্যমান নয়। বরং অবস্তুগত চিন্তা বা অনুভূতি। অথচ আমরা সুখ-লাভের আশায় দৃশ্যমান বস্তুর পেছনে ছুটছি। সুখ পরিমাপ করা যায় না, কোনো মাধ্যমে অর্জনও করা যায় না। সুখ আল্লাহপ্রদত্ত। এটা মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে সন্তুষ্ট হয়, সুখ অর্জনের জন্য তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। অন্যদিকে অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পরও যে সন্তুষ্ট হয় না, সে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। সুখ পাখির সন্ধান সে আর পায় না।

আমরা সবাই ব্যস্ত। জীবনের রঙিন স্বপ্নগুলো না দেখে রাতে আমাদের ঘুম আসে না। কিন্তু সেই স্বপ্নগুলোর পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা কি খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছি না? প্রতিনিয়ত স্বপ্নগুলোর পেছনে ছুটে চলার উদ্দেশ্য হলো–একটু ভালো থাকা, জীবনটাকে একটু উপভোগ করা। কিন্তু এই 'একটু'র জন্য অনেক সময় বিরাট মূল্য দিতে হয়। প্রভূত অর্থের মালিক হওয়া, কর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করা খারাপ নয়। কিন্তু এগুলো অর্জনের জন্য বিবেকহীন মাদকাসক্তের ন্যায় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। বরং ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন-বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে, স্বপ্ন সত্যি না হলেও পুণ্য ঠিকই মিলবে।

সুখ অর্জনে বাধাসমূহ

সুখ অর্জনের একটি বড় বাধা হলো, জীবনে চিরস্থায়ী সুখের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী সুখকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া। উঁচু দালান, দামি গাড়ি, প্রচুর টাকা, স্বর্ণ-অলঙ্কার ইত্যাদি থাকাকেই আমরা সুখ বলে বিবেচনা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলোতে সুখ নেই। এই জাগতিক বস্তু আমাদের ক্ষণিকের মন-ভোলানো আনন্দ দিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান দিতে পারে না। টাকা পয়সা, ধন সম্পদ এগুলো কেবল মানুষের চাহিদাই বৃদ্ধি করে, এগুলো সব সময় মানুষের কাছে থাকেও না। জীবন যখন মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে, মানুষ তখন ঠিকই বুঝতে পারে, সে আসলে কতটা ভুল! মানুষ হালাল-হারাম বাছবিচার ছাড়াই প্রভূত সম্পত্তির মালিক হতে পারে। অর্থের দম্ভে নিজের রবকে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যদি কোনো কঠিন ব্যাধিতে

[১] হাদীস নং-৬৪৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৫১।

কাউকে আক্রান্ত করেন, তখন কষ্টে অর্জিত টাকাগুলো কী এই নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, সে ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠবে?

সুখ অর্জনের আরেকটি বাধা হলো, আমরা জানিই না সুখের প্রকৃত উৎস কোথায়? আমরা মনে করি, সুখ বুঝি শুধু এই দুনিয়াতেই রয়েছে। মরলেই সব শেষ। অথচ মরণের মাধ্যমেই আমাদের আসল জীবন শুরু হয়। আমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই ব্যস্ত; অথচ ওপারের জীবন চিরস্থায়ী।

ধরা যাক, রফিক সাহেব একরাত যাপনের জন্য একটি সস্তা হোটেলে উঠলেন। রুমে ঢুকে দেখলেন বিছানার চাদর ময়লা, ফ্যান নষ্ট, বাথরুম অপরিষ্কার। তখন তিনি বাজারে গিয়ে একটা নতুন চাদর ও ফ্যান কিনে আনলেন এবং হোটেলে ফিরে বাথরুম পরিষ্কার করলেন। এবার পরের দিন হোটেল মালিক তার কেনা জিনিসগুলো দিতে অসম্মতি জানানোর কারণে তিনি খালি হাতেই আবার গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এখন রফিক সাহেবকে আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারি? তিনি কি বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন? তিনি হয়তো বোকার মতো কাজ করেছেন। কিন্তু এই একই ভুল কী আমরাও সজ্ঞানে করছি না? দু'দিনের এই পৃথিবীতে আমরা সম্পদের পেছনে ছুটে চলেছি, বাড়ি-গাড়ি বানানোর প্রতিযোগিতা করছি। অর্থ-সম্পদের লোভে আমাদের মুখ সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। অতঃপর একদিন মৃত্যু এসে মাটি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেয়। জীবনের চির সমাপ্তি!

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।[১]

[১] সূরা আল ইমরান: ১৪

সম্পর্ক হলো পরীক্ষা

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অনেকগুলো সম্পর্কের জালে নিজেকে আবদ্ধ করে। স্রষ্টা, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, সমাজ-রাষ্ট্র-পরিবেশ ইত্যাদিকে ঘিরে মানুষের জীবন চক্র আবর্তিত হয়। সম্পর্কগুলো মূল্যবান। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এ সম্পর্কগুলো কখনো মানুষকে আনন্দ দেয়, ভালোবাসার চাদরে আগলে রাখে; আবার কখনো অনির্বচনীয় বেদনায় কাতর করে। প্রত্যেক সম্পর্ক ঘিরে মানুষের কিছু আকাঙ্ক্ষা-বাসনা থাকে। সে আকাঙ্ক্ষা-বাসনার বাস্তবায়নে মন খুশিতে ভরে উঠে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে জীবনে দেখা দেয় হতাশা-দুঃখ-বেদনা-অনুশোচনা।

এটা সত্যি যে—সম্পর্কের একটা চাপ রয়েছে। এটা শুধু উপভোগের জন্য নয়। প্রত্যেক সম্পর্ক, কিছু না কিছু দায়ভার চাপিয়ে দেয়। এ দায় অস্বীকার করা কঠিন। দ্বায়িত্ব পালনে অনুরত থাকা ব্যতীত সম্পর্ক টিকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে ঘিরে একজন পুরুষ এবং নারীর উপরে অনেকগুলো দায়ভার অর্পিত হয়। যথাযথভাবে দ্বায়িত্ব পালনে দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর হয়, নয়তো বিচ্ছিন্নতাকে বরণ করে নিতে হয়।

সম্পর্ক নিয়ামত। সম্পর্ক হচ্ছে পরীক্ষা। অস্তিত্বের প্রশ্নে সম্পর্ক অনিবার্য। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক সম্পর্কের মায়াজালে সকলকেই প্রবেশ করতে হয়। মানুষ কেবল ইতিবাচক বিষয়কেই গ্রহণ করতে চায় এবং নেতিবাচকতাকে সর্বদা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্পর্ক সবর্দা মধুর হবে এমন নয়। পদার্থের তিন অবস্থার মতো একেকটি সম্পর্ক একেক রকম হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলো যতই কঠিন হোক না কেন, বুদ্ধের মতো এর থেকে পালানো যাবে না। পলায়ন প্রবৃত্তিকে রুখে দিতে হবে। সম্পর্ক থেকে পলায়নের অর্থ হচ্ছে জীবন থেকে পলায়ন। ইসলামের দৃষ্টিতে পলাতকরা পাপী। বৈরাগ্য ইসলামে বৈধ নয়। জীবন সংগ্রামের জন্য। আশা-ভরসা-ধৈর্যে জীবন যাপন করতে হয়। উত্তরণের আশা ত্যাগ করে জগত-সংসারের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা কাপুরুষতা। এটা ভীরুদের কাজ।

সম্পর্ক থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শারীরিক-মানসিক চাপ হতে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব। এতে দায় এড়িয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে এরূপ দায়মুক্ত করেন নি। বরং মানুষকে দায়িত্বশীল হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং অতিরঞ্জন কোনোটাই কাম্য নয়। প্রত্যেককে সম্পর্কের শারীরিক-মানসিক চাপ এবং সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটাই পরীক্ষা। এ পরীক্ষা থেকে স্বেচ্ছায় অব্যহতি (আত্মহত্যা) নেওয়ার সুযোগ যেমন নেই, তেমনি বিদ্রোহ করে সম্পর্কচ্ছেদ করার সুযোগও নেই। বরং সম্পর্কের দাবি পূরণের চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য। তিনি বিদ্রোহী এবং পলাতকদের পছন্দ করেন না। সম্পর্কগুলোকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নিতে হবে। স্রষ্টার সন্তুষ্টিতেই অস্তিত্বের সার্থকতা। মানুষ এরূপে তার অর্থহীন জীবনকে স্রষ্টার নিকটে অর্থপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস পায়।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ

সুখের উপকরণ সম্পর্কে আমাদের মাঝে ভুল ধারণা রয়েছে। জাগতিক বস্তু আমাদের ক্ষণিকের আনন্দ দেয়, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখের সন্ধান দিতে পারে না। আমরা যখন সুখ অনুভব করি, তখন আমাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন-এর নিঃসরণ হয়। ক্ষণিকের এ-আনন্দই যদি প্রকৃত সুখ হতো, তাহলে নেশাখোর এর নেশার মধ্যেও রয়েছে সুখ। কারণ মাদক-গ্রহণেও ডোপামিন-এর নিঃসরণ হয়। একজন মাদকাসক্তের জীবনকে কিন্তু আমরা কখনোই সুখী ব্যক্তির জীবন হিসেবে বিবেচনা করি না।

আমাদের উচিত সুখের এমন উৎসের সন্ধান করা, যা আমাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সন্ধান দিবে। আমাদের আত্মাকে প্রশান্ত করবে এবং জীবনের সঠিক মূল্য বোঝাতে সাহায্য করবে। পৃথিবীতে সম্পদ, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, জাগতিক উন্নতির বহুপথ থাকলেও সুখ অর্জনের একমাত্র পথ হলো–আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা। নিজের জীবনকে ইসলাম দিয়ে সাজানোর মাধ্যমেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ।

আমরা অনেকেই মনে করি, আমাদের জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী। যদিও কথাটি ভুল নয়। তবে যদি আমরা আখিরাতকে আমাদের প্রকৃত জীবন হিসেবে দেখি, তাহলে আমাদের জীবন অনন্ত। পৃথিবীর এ জীবনের অধ্যায় শেষ করার পর আখিরাতে সকলকে অনন্ত সময় পার করতে হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হলো আখিরাতের জীবনকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া এবং সে অনুসারে দুনিয়ার এ জীবনকে গড়ে তোলা। জীবনপথের এ যাত্রায় আমাদের একমাত্র গন্তব্য হওয়া উচিত আখিরাত।

জান্নাত হলো প্রত্যেক মুসলিমের কাঙ্ক্ষিত জায়গার নাম। যেখানে দুঃখের কোনো স্থান নেই, আছে কেবল সুখ আর সুখ। আমরা অনেকেই ভাবি, দুঃখ না থাকলে সুখ কীভাবে অনুভব করব? জান্নাত হলো এমন জায়গা, যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত এমন এমন নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করবে, যা তাদের সুখের মাত্রাকে বাড়াতেই থাকবে। প্রতি মুহূর্তে আগের চেয়ে বেশি সুখ অনুভূত হবে। একঘেয়েমি আসার সুযোগও সেখানে নেই।

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ.

(জান্নাতে নিয়ামতের ধারাবাহিকতা) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।[১]

দুনিয়াবি জীবন ও জান্নাতি জীবনের পার্থক্য

আমরা মুসলিমরাও জীবনের ব্যাপারে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। তবে তা দুনিয়ার এ জীবনে নয়; বরং আখিরাতের জীবনে। মানুষের চাহিদা অসীম। অসংখ্য মানুষের অসীম চাহিদা পূরণের মতো নিয়ামত পৃথিবীতে নেই। সসীমের মাঝে অসীমকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোকামি বৈ কিছুই নয়। আর এ ব্যর্থ চেষ্টা পরিণত হয়েছে কাড়াকাড়িতে। কে কতটা দখল করতে পারে, ভোগ করতে পারে, সে প্রতিযোগিতায় মানুষ মত্ত হয়েছে। আর এ মত্ততা জন্ম দিয়েছে আরো কিছু জটিল সামাজিক রোগের, যার নির্মূল ব্যতীত পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আখিরাতে নিয়ামত অফুরন্ত। সেখানে অগণিত জান্নাতবাসীর সীমাহীন চাওয়া-পাওয়াও জান্নাতের নিয়ামতের অফুরন্ততাকে অতিক্রম করতে পারবে না। সে জগতে বস্তুবাদী হওয়া চলে; কিন্তু দুনিয়ার সসীমতার মাঝে খুব কম মানুষই তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। আর এ অপ্রাপ্তি মানুষের হৃদয়কে হতাশা ও বিষাদে পূর্ণ করে দেয়। এজন্য দুনিয়ার প্রতি যৌক্তিক মানসিকতা এই যে, দুনিয়ার জীবনে প্রয়োজনের অধিক প্রত্যাশা না রাখা। আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূরণ থাকা আমাদের যতটা কষ্ট দেয়; বিপরীতে, পার্থিব দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে জাগতিক বাসনা পূরণের অনাকাঙ্ক্ষা, মানুষের জীবনে সীমাহীন সুখানুভূতি তৈরি করতে সক্ষম।

[১] সূরা আল ওয়াকিয়া: ৩৩।

পরশ্রীকাতরতা

সুখ অর্জনের একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো–পরশ্রীকাতরতা। অন্যের সম্পদ দেখে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের সুখ হতে বঞ্চিত করে। আবার অন্যের প্রাপ্তি দেখে নিজের অপ্রাপ্তির জন্য হীনমন্যতায় ভোগাও আমাদের জীবনকে হতাশা ও দুর্দশায় ভরিয়ে দেয়। জীবনে প্রাপ্ত সকল নিয়ামতকে পর্যাপ্ত এবং নিজের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত প্রাপ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং অন্যের প্রাপ্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও নিজের অপ্রাপ্তির জন্য হতাশাগ্রস্থ হওয়া যাবে না। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, 'আল্লাহ কেন অমুককে এত বেশি ধন-সম্পদ দেন, আমাকে কেন দেন না! আমি নামায, রোযা করি, তবে কেন আমি বেশি সম্পদ পাচ্ছি না?'

প্রথমত, দুনিয়ায় কোনো কিছুর প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া আমাদের আখিরাতের জীবনের জন্য সুখকর নয়। বরং এরূপ মানসিকতা তৈরি হওয়া ভয়ের কারণ। আল্লাহ আখিরাতে দুনিয়াতে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের হিসাব নিবেন। এক্ষেত্রে ধন-সম্পদ বেশি হওয়া আমাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। আমরা তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব, যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ধন-সম্পদ লাভের জন্য ঈমান শর্ত নয়। তিনি রহীম এবং রহমান। অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহ ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন আর না আনলে কমিয়ে দিবেন, বিষয়টি এরূপ নয়। আমাদের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাউকে কম দিয়েছেন আবার কাউকে বেশি দিয়েছেন। দুনিয়াতে আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ধন-সম্পদই কেবল আমরা ভোগ করতে পারব। এজন্য দেখা যায় যে, আল্লাহ অনেক অমুসলিমকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন। এ নিয়ামতগুলো আল্লাহ পূর্ব থেকেই তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ধন-সম্পদ কম বা বেশি হওয়ার সঙ্গে ঈমানদার হওয়া না বা হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়ার এ সব নিয়ামত আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। এ সব নিয়ামতের কোনো মূল্য যদি মহান আল্লাহর কাছে থাকত, তবে তিনি কাফিরদের এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। এজন্য বাহ্যিক কষ্ট-ক্লেশকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে।